এইসময়
সংবাদপত্র

*** কথাসরিৎ ***

এই যে খুনে সভ্যতা
অনেক জনের অন্ন মেরে কয়েক জনের ভব্যতা
এগোয় নাকো পেছোয় নাকো অচল গতি ত্রিশঙ্কুর—।
— দিনেশ দাস

পূর্বগামী

কেন্দ্রীয় সরকার বেশ কিছু বছর হল, ‘লুক ইস্ট’ নীতির কথা ঘোষণা করেছেন। এখন প্রয়োজন সেই নীতিটিকে বাস্তব কর্মকাণ্ডে রূপান্তরিত করা। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর আসন্ন ত্রিদেশীয় সফর সেই উদ্দেশ্য পূরণের উপযুক্ত সুযোগ। কেন্দ্রীয় সরকারের উচিত সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করা। মোদীর সফরের প্রথম গন্তব্য মায়ানমার, যেখানে তিনি আসিয়ান-ইন্ডিয়া বৈঠক ও ইস্ট এশিয়া বৈঠকে অংশগ্রহণ করবেন। বৈঠকগুলি অনুষ্ঠিত হতে চলেছে এক গুরুত্বপূর্ণ সময়ে। বিশ্বের ভূ-রাজনৈতিক প্রেক্ষিত ক্রমেই কেন্দ্রীভূত হচ্ছে এশিয়ায়। এক দিকে যেমন চিন অন্যতম প্রধান শক্তিধর দেশ হয়ে উঠেছে, অন্য দিকে বিশ্ব-রাজনীতিতে জাপানে শিনজো আবে-র নেতৃত্বাধীন সরকারের তৎপরতা ক্রমবর্ধমান। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিদেশনীতিতেও এই অঞ্চলটি বিশেষ গুরুত্ব পেতে শুরু করেছে। দুর্ভাগ্যজনক যে ভারত এশিয়ার বহুপাক্ষিক জোটে অন্তর্ভুক্তির জন্য এত দিন পূর্ণ মাত্রায় তৎপরতা দেখায়নি। উদাহরণ, গত সপ্তাহে বেজিং-এ অনুষ্ঠিত অ্যাপেক-এর (এশিয়া-প্যাসিফিক ইকোনমিক কো-অপারেশন) বৈঠক। এই গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে ভারতের অনুপস্থিতি হতাশাজনক।

এশিয়-প্যাসিফিক অঞ্চলের দেশগুলির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতর সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য মোদী সরকারের অ্যাপেক-এর সদস্যপদ প্রাপ্তির জন্য প্রয়াসী হতে হবে। তার সঙ্গে প্রয়োজন বিভিন্ন মুক্ত বাণিজ্য চুক্তিতে অংশীদারিত্বের উদ্যোগ। যেমন রিজিয়োনাল কমপ্রিহেনসিভ ইকোনমিক পার্টনারশিপ বা প্রস্তাবিত ফ্রি ট্রেড এরিয়া অফ দ্য এশিয়া-প্যাসিফিক। যদি এই প্রয়াস সফল হয়, তবে ভারত এই অঞ্চলে শুধু কৌশলগত সুবিধা লাভ করবে এমন নয়, তার সঙ্গে অর্থনৈতিক বৃদ্ধির সম্ভাবনাও জোরালো হয়ে উঠবে। তবে ভারত যদি বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার মতো একগুঁয়ে অবস্থান এ ক্ষেত্রেও গ্রহণ না করে, একমাত্র তা হলেই এই প্রয়াস সফল হতে পারে।

মোদীর দ্বিতীয় গন্তব্য অস্ট্রেলিয়া । এবং এই প্রথম ভারতের কোনও প্রধানমন্ত্রী অস্ট্রেলিয় সংসদের যৌথ অধিবেশনে বক্তব্য রাখবেন। তার থেকেই স্পষ্ট যে অস্ট্রেলিয়া ভারতের সঙ্গে সম্পর্ককে কতটা গুরুত্ব দিচ্ছে। একই ভাবে, ভারতীয় সরকারকেও প্রধানমন্ত্রীর সফরের সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে হবে। খনিজ শিল্প, পরিষেবা ক্ষেত্র বা শিক্ষাক্ষেত্রে উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত করতে পারে অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে বাণিজ্যিক ঘনিষ্ঠতা। দ্বিতীয়ত, জাপান ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে এই দুই দেশ মিলে গড়ে তুলতে পারে এক নতুন গোষ্ঠী যা এশিয়-প্যাসিফিক অঞ্চলের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করবে।

শেষ গন্তব্য ফিজি আয়তনে ক্ষুদ্র হলেও তাৎপর্যপূর্ণ। ফিজি সফরের সিদ্ধান্ত প্রমাণ করছে ভারতের কাছে এই অঞ্চলটির গুরুত্ব। এক বড়ো সংখ্যক ভারতীয় বংশোদ্ভূত মানুষের বাস এই দেশে। কাজেই ভারতের কাছে এই দ্বীপপুঞ্জ একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র, যেখান থেকে এশিয়-প্যাসিফিক অঞ্চলের অন্যান্য দেশের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাড়ানো সম্ভব। এটিই উপযুক্ত সময় বিদেশনীতির ক্ষেত্রে জড়তা কাটিয়ে পূর্ব এশিয়ায় ভারতের সচল ও সক্রিয় উপস্থিতি স্থাপনের।

জীবিত ও মৃত

‘কাদম্বিনী মরিয়া’ প্রমাণ করেছিল যে ‘সে মরে নাই’। সৌভাগ্যবশত প্রত্যেকে কাদম্বিনীর মতো অভাগী নন, কাজেই জীবিতাবস্থার প্রমাণ দেওয়ার জন্য জীবনত্যাগের চূড়ান্ত পদক্ষেপ না করলেও চলে যায়। কিন্তু তার পরিবর্তে যা করতে হয়, তা মরণদশার সঙ্গে তুলনীয় না হলেও প্রায় অর্ধমৃতাবস্থায় পৌঁছে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট। অন্তত নভেম্বর মাসের সেই দিনটিতে, যে দিন অসুস্থ বা পঙ্গু হওয়া সত্ত্বেও অবসরপ্রাপ্ত বৃদ্ধবৃদ্ধাদের ব্যাঙ্কের দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে প্রমাণ করতে হয়, এখনও তাঁদের হৃৎপিণ্ডটি চলমান। যদি কেউ সশরীরে হাজিরা দিতে নিতন্তই অসমর্থ হন, তা হলে তাকে জোগাড় করতে হয় শংসাপত্রে কোনও গেজেটেড সরকারি আধিকারিকের দস্তখৎ। কিন্তু সেটিও সাধারণ মানুষের পক্ষে খুব সহজে আহরণযোগ্য নয়। অবসর ভাতাটিকে চালু রাখার জন্য ব্যক্তিগত শারীরিক উপস্থিতির এহেন প্রথাটি যে আদৌ মানবিক নয়, সে সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ কম। সুখের কথা, সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকার এই প্রথাটি বন্ধ করতে উদ্যোগী হয়েছে। আধার কার্ড-এর ভিত্তিতে ডিজিটাল শংসাপত্রের একটি প্রকল্প চালু করা হয়েছে, যা সফল হলে দেশের প্রায় এক কোটি অবসর ভাতাপ্রাপক বৃদ্ধবৃদ্ধা বাৎসরিক হয়রানির হাত থেকে রেহাই পাবেন। প্রামাণ্য হিসেবে গেজেটড আধিকারিকদের দস্তখত জোগাড়ের প্রাচীন রীতিটিকে ইতিমধ্যেই বহু ক্ষেত্রে বাতিল করা হয়েছে। ফলত সরকারি পরিষেবাপ্রাপ্তির গতিটি দ্রুততর হবে বলে আশা। তার সঙ্গে চালু হতে চলেছে জীবিতাবস্থা প্রমাণের জন্য ডিজিটাল শংসাপত্রের ব্যবস্থা, নিজস্ব স্মার্টফোন বা কম্পিউটারের মাধ্যমেই যা নিষ্পন্ন করা সম্ভব। যে সফটওয়ার-এর মাধ্যমে কাজটি করতে হবে, তা বিনামূল্যে সরকার সরবরাহ করবে। দূরবর্তী অঞ্চলে, যেখানে কম্পিউটার বা স্মার্টফোন সুলভ নয়, সেখানে থাকবে বিশেষ পরিষেবা কেন্দ্র।

প্রকল্পটির প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব নিয়ে বিশেষ বিতর্কের অবকাশ নেই। এটি অনস্বীকার্য যে একমাত্র তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহারেই জীবিতাবস্থা প্রমাণের বন্দোবস্তটিকে আরও মানবিক করে তোলা সম্ভব। কিন্তু কর্মসূচিটিকে সফল করতে গেলে পাশাপাশি ‘ডিজিটাল বিভাজন’-এর সমস্যাটিকেও ভাবা প্রয়োজন। ‘ডিজিটাল বিভাজন’, অর্থাৎ তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারে কুশলতার নিরিখে সামাজিক বিভাজন। এই বিভাজনের একটি মাত্রা শ্রেণিভিত্তিক, আর্থিক ও শিক্ষাগত যোগ্যতানির্ভর। কিন্তু আর একটি মাত্রাও আছে, যা বয়সের সঙ্গে সম্পর্কিত। অল্পবয়স্করা যত সহজে কম্পিউটার বা স্মার্টফোনের সুলুকসন্ধান করতে পারে, বয়স্ক মানুষরা তুলনায় ততটা পারঙ্গম নন। এই ফারাকটি ঘুচানো দরকার। প্রয়োজন বয়স্ক মানুষদের তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহারে সক্ষম করে তোলা, যাতে তাঁরা অনায়াসে সরকারি পরিষেবার সুবিধা উপভোগ করতে পারেন। বলা অসঙ্গত নয় যে বিশেষ পরিষেবা কেন্দ্র যথোপযুক্ত প্রশিক্ষণের কোনও বিকল্প হতে পারে না, কারণ যদি বিশাল সংখ্যক মানুষ অক্ষমতার জন্য পরিষেবা কেন্দ্রে যেতে বাধ্য হন, তবে ফের সেই লাইনে দীর্ঘ অপেক্ষার ফেরে পড়তে হবে তাঁদের। আশা করা যায়, কর্মসূচিটি রূপায়ণের সময় এই সমস্যাটির সমাধানেও সরকার সক্রিয় হবে।

*** অসংখ্যা ***

৫৪৪০০০
০০০০০০

(চুয়ান্ন হাজার চারশো কোটি) ডলার— বিশ্বের সব থেকে মূল্যবান স্থাপত্য আইফেল টাওয়ার-এর বর্তমান দাম।

*** দিনকেদিন ***

১৩ নভেম্বর

১৮৩১: স্যার অ্যাশলে ইডেন জন্মগ্রহণ করেন।
১৮৪৭: মির মোশাররফ হোসেন জন্মগ্রহণ করেন।
১৮৫০: রবার্ট লুই স্টিভেনসন জন্মগ্রহণ করেন।
১৮৯৮: ভগিনী নিবেদতা বাগবাজারে বোসপাড়া লেনে স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন।

উন্নয়নের সংকল্পের তো শেষ নেই মূল প্রশ্নগুলোর উত্তর মিলছে কি?

‘মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল’-এর পরে এ বার ‘সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল’। উদ্দেশ্য মহৎ, কিন্তু বাস্তব রূপায়ণ? লিখছেন **ধ্রুবজ্যোতি ঘোষ**

২০১৫ সালকে আমরা নাম দিতে পারি আন্তর্জাতিক সংকল্প গ্রহণের বছর! বেশ কয়েক ছড়া সংকল্প চড়া তৎপরতায় গড়ন ধরছে। কাউকে যেন দেখতে শুনতে খারাপ না হয়! মৃৎ শিল্পীরা যেমন মনের মাধুরী নিয়ে প্রতিমা গড়েন, স্থায়ী হবে না জেনেও। গোড়াতেই এত কথা এই জন্য যে তিন তিনটি সংকল্প লাইন করে দাঁড়িয়ে আছে। সবচেয়ে ধুমধামের সংকল্প হল ‘সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল’ বা এসডিজি-কে কেন্দ্র করে। এসডিজি হল এমডিজি বা ‘মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল’-এর পরের প্রজন্ম। তার পর আছে আমাদের পরিচিত, অতি পরিচিত, প্রায় রান্নাঘরে ঢুকে পড়া সংকল্প তথা ক্লাইমেট চেঞ্জ সংক্রান্ত পরবর্তী সংকল্প। এর পরে হল বিপর্যয়জনিত ঝুঁকি কমানো নিয়ে। এ সবই সুন্দর মলাটে রিসাইকলড কাগজে দুর্দান্ত ছাপাই, বাঁধাই ও মলাট সহযোগে মাঠে নামবে। অনেক সেমিনার হবে, কাগজে বেরবে, আমরা জানি সেমিনার বড়ো ধরনের হলে কত বড়ো জায়গায় সে সব অধিবেশন হয়। আগে থেকে প্লেনের টিকিটের ব্যবস্থা হয়ে থাকে।

আজ আলোচনা করব ‘সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল’ সংক্রান্ত সতেরো দফা খসড়া কর্মসূচি ওরফে ‘সংকল্প’ নিয়ে যা তাবৎ জগৎবাসীর ইন্টারনেটে দৃশ্যমান। অবাক লাগে। বলা হচ্ছে এটা হল মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্টের পরের বা নাম-পাল্টানো সংস্করণ। উন্নয়নকে কেন্দ্র করে সংকল্পের বাসি ফুল সরিয়ে নতুন ফুল বসানো হবে— এতে আমরা অভ্যস্ত হয়ে গেছি। কিন্তু ট্রুম্যান সাহেবের মহান উন্নয়ন তত্ত্বের অনেক বছরও হল। অনেক উন্নয়নও নিশ্চয় হয়েছে কিন্তু অনেক কিছুই যে হিসেব মতো হতে পারেনি তাও তো আমরা জানি। হতে না পারা নিয়ে বেশ কিছু জোরালো লেখা, এমনকী বইও বেরিয়েছে। অথচ কেন ভুল থেকে শেখার কোনও প্রবণতা নেই, কেন কোথাও ভুল স্বীকার করা নেই? এখনও কি বুড়ো খোকারা তেলের শিশি ভাঙার জন্য খুকুর উপরে রাগ করবে আর নিজেরা যে স্বদেশ ভেঙে ভাগ করার মতো একটার পর একটা গর্হিত কাজ করে চলেছে তা একেবারে চেপে যাবে? এখানেই উদ্দেশ্যের সততা নিয়ে সন্দেহ হয়।

কে সুনীল প্রসাদ

অহিংসা। বেঙ্গালুরুতে যুদ্ধবিরোধী পথনাটিকায় অভিনয় করছে পথশিশুরা

এসডিজি বা ‘সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল’ নিয়ে বিনম্র প্রতিবাদ বা সমালোচনা শুরু হয়েছে। তা-ও আবার যে সে জায়গায় নয়, ‘নেচার’ পত্রিকায়। আলোচনা তথা সমালোচনা করেছেন মার্ক স্ট্যাফোর্ড স্মিথ। উনি হলেন ফিউচার আর্থ-এর বিজ্ঞান কমিটির চেয়ারম্যান এবং অস্ট্রেলিয়ার ক্যানবেরাতে উপস্থিত কমনওয়েলথ সাইন্টিফিক ও ইন্ডাস্ট্রিয়াল গবেষণা সংগঠনে মুখ্য বিজ্ঞান গবেষক হিসেবে যুক্ত। গত ১৮ সেপ্টেম্বরের সংখ্যায় তিনি কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কথা লিখেছেন।

স্মিথ সাহেবের আলোচনার বিষয়বস্তু হল সতেরো দফা যে খসড়া কর্মসূচি রাষ্ট্রসংঘের দপ্তর হাজির করেছে তাই নিয়ে। প্রথমেই তাঁর আপত্তি সতেরো দফা নিয়ে। তিনি বলেছেন এত বেশি দফার চাপে পুরো খসড়াটির দফারফা হতে চলেছে। এই সতেরোটার আবার প্রত্যেকেরই দফা আছে। তারা যোগ হলে ১৬৯টি আলাদা আলাদা লক্ষ্যবস্তু স্থির হয়েছে। এ সবই বারো মাসের মধ্যেই পাকা করে ফেলতে হবে। খসড়া আর তখন খসড়া থাকবে না।

স্মিথ সাহেব সরাসরি বিজ্ঞানীদের আক্রমণ করেছেন। রেখেঢেকে করেননি। তাঁর বক্তব্য হল যে, বিজ্ঞানীরা নিশ্চয় এই খসড়া বানাতে সাহায্য করেছেন কিন্তু তাঁদের ‘সংযোজন দুর্বল, বিক্ষিপ্ত এবং অসংযুক্ত’। কর্মনীতির সমালোচনা করে তিনি বলেছেন যে গুরুত্বপূর্ণ কাজের তালিকা করতে গিয়ে সেটি একটি ‘বেঢপ এবং অবাস্তব সবকিছু একসাথে করার’ চেষ্টায় পরিণত হয়েছে। অন্য আর এক জায়গায় বলেছেন যে খাদ্য সুরক্ষার ক্ষেত্রে বলা হয়েছে যে ২০৩০ সালের মধ্যে ‘সাসটেনেবল ফুড প্রোডাকশন’ সুনিশ্চিত করতে হবে। এই লক্ষ্যবস্তুটি খুবই ‘আবছা এবং নাইট্রোজেন, ফসফরাস এবং জলের চক্রের উপর কী ধরনের চাপ পড়বে তার কোনও উল্লেখ নেই।’ জলসম্পদের ক্ষেত্রে লক্ষ্য একই ভাবে অস্পষ্ট। বলা হয়েছে ‘জল ব্যবহারের কার্যকারিতা ২০১০-এর মধ্যে সর্বক্ষেত্রেই যথেষ্ট বাড়াতে হবে’। কাগজে যে সম্পাদকীয় লেখা হয় তাতেও এ রকম দায়সারা মন্তব্য এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা হয়।

স্মিথ সাহেব আর একটি গুরুত্বপূর্ণ সমালোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন সমস্ত অভিমুখগুলির একটি সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য থাকা দরকার। খসড়া কর্মসূচিতে অনেক ক্ষেত্রে পরস্পর বিরোধী লক্ষ্য স্থির করা হয়েছে।

খসড়া কর্মসূচিতে খুব জোর দেওয়া হয়েছে দারিদ্র দূরীকরণে। দারিদ্র বরদাস্ত করা যাবে না। ভাবছি দারিদ্র বলতে লেখকরা কী বোঝেন। আমাদের দেশে দরিদ্র নারায়ণ না থাকলে, ফি বছর খরা-বন্যার ছোবল না থাকলে বহু মাঝখানের লোকেদের কামাই বন্ধ হয়ে যেত, বিদগ্ধ মানুষের সেমিনার, ‘কি-নোট অ্যাড্রেস’— এ সব হতে পারত না, আরও আনুষঙ্গিক সমস্যা বা ক্ষয়ক্ষতি যা সব কিছু লেখার জায়গা এটা নয়— সে সব হত। তা হলে দারিদ্র আর উন্নয়নের মধ্যেকার সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা নেই কেন? উন্নয়ন হল নিরবচ্ছিন্ন ভাবে বাড়তে থাকা বাজার। আসলে দারিদ্র না থাকলে আমাদের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাটাই ভেঙে পড়বে।

> অস্ত্র-গোলা-বারুদ এ সবের কারবার চলে ৮০০ বিলিয়ন ডলার নিয়ে। সেই সময় সকলের প্রাথমিক শিক্ষার জন্য ব্যয় ৬ বিলিয়ন ডলার, পানীয় জল আর শৌচাগার প্রকল্পে সারা পৃথিবীর জন্য ৯ বিলিয়ন ডলার, ইউরোপে আইসক্রিমের বাজার ১১ বিলিয়ন ডলার।

অধিকাংশ মানুষ যদি লাগাতার কোনও না কোনও ভাবে ঠকতে না থাকে তবে মুনাফা পাগলের মতো বাড়বে কী করে? এ সবই তো আজকের সহজ পাঠ। উন্নয়নের টেকসই ভাব বজায় রাখার একটি প্রধান শর্ত হল পৃথিবীর সব মানুষকে বাজারজাত করা। গরিব মানুষ, তা যে যত গরিবই হোক, সে যদি একটা মোবাইল ফোন কিনতে পারে তবে তার দারিদ্র বা অন্য কোনও সামাজিক হয়রানির কথা না ভাবলেও চলবে। কিন্তু যদি কিছুই কিনতে না পারে তখন অবশ্যই তাকে নানা রকমের ভরতুকি দিয়ে বাজারে যাবার ক্ষমতায় জড়ো করতে হবে। একেই উন্নয়ন বলে, বাজারের জয়গানই তো উন্নয়নের অহঙ্কারের মার্গ সঙ্গীত।

পৃথিবী যে অর্থনৈতিক তত্ত্বের ভিত্তিতে চলছে সেখানে দারিদ্র থাকবেই। একই সঙ্গে থাকবে দারিদ্র কমানোর প্রচেষ্টা যাতে অনেক বেশি মানুষ যেন ন্যূনতম ক্রয় ক্ষমতারও নীচে না চলে যায়। অর্থাৎ দরিদ্রকরণ বজায় থাকবে আর একই সঙ্গে তার দূরীকরণের বাদ্যিও বাজবে। দারিদ্র নিয়ে এই দ্বিচারিতাই আজকের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার তত্ত্বগত পাটাতন। সাসটেনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল যা-ই বলুক।

শেষের আগে চোখে পড়ল সংকল্প লেখার একটা নতুন ধরনের বয়ান। ২০১০-এর মধ্যে বেআইনি অস্ত্র ইত্যাদির ব্যবহার অনেকটাই কমিয়ে ফেলতে হবে বলে ঘোষণা হয়েছে ১৬.৭ নং সংকল্প তালিকায়। ভালো কথা। খুবই ভালো কথা। তা কত বড়ো এই অস্ত্রের কারবারটি? ১৯৯৮ সালের হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট রিপোর্ট একটা অদ্ভুত হিসেব হাজির করেছিল। এই হিসেব পরে আর কখনও চোখে পড়েনি। অস্ত্র-গোলা-বারুদ এ সবের বাজারের কারবার চলে ৮০০ বিলিয়ন ডলার নিয়ে। সেই সময় সকলের প্রাথমিক শিক্ষার জন্য ব্যয় ধার্য ছিল ৬ বিলিয়ন ডলার, পানীয় জল আর শৌচাগার প্রকল্পে সারা পৃথিবীর জন্য ৯ বিলিয়ন ডলার, ইউরোপে আইসক্রিমের বাজার ১১ বিলিয়ন ডলার, আমেরিকায় কসমেটিকস বা সাজসজ্জায় ৮ বিলিয়ন ডলার। কার কত গুরুত্ব তা এই ছোটো হিসেব থেকে জলের মতো পরিষ্কার হয়ে যায়। কিন্তু সমস্যাটা আরও গভীরে। ১৯৯৮ সালে বেরনো রাষ্ট্রসংঘের এই হিসেবের উপরে কোনও সেমিনার, আলোচনা বা নীতিগত পরিবর্তনের কোনও কথাই আমরা শুনতে পাইনি। কী অসামান্য ঘুম-পাড়ানি গান দিয়ে সমস্ত চেতনার ক্ষেত্রগুলি নীরব করে রাখা আছে। আজকে ওই ৮০০ বিলিয়ন ডলার বেড়ে ২০০০ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে গেছে।

সহজ প্রশ্ন। আপনারা কী ভাবে এই প্রকাণ্ড বাজারকে সামলাবেন ভেবেছেন? মন্দিরে, গির্জায়, মসজিদে আবদার জানিয়ে? আইন করে, সেমিনার করে? প্রতিরক্ষার খাতে খরচ কমানোর অনুরোধ করে? জঙ্গিদের অনুরোধ করে? রাষ্ট্রসংঘের ফতোয়া দিয়ে? ছোটোদের নীতি শিক্ষার বইতে নতুন কথা লিখে? আমরা প্রত্যেকে চাই উগ্রপন্থীরা নিরস্ত্র হোক। যুদ্ধবাজরা অস্ত্র সংবরণ করুক— এ সবের জন্য কোনও সংকল্পের দরকার পড়ে না। প্রয়োজন ছিল নতুন রাস্তা দেখানোর। সেই রাস্তাটাই সংকল্পের আকারে আমাদের সামনে রাখতে পারলে এসডিজি-এর সারবত্তার উপর আমাদের মতো সাধারণ মানুষের আস্থা জন্মাত।

ভয় হয় দুনিয়াটাই বুঝি বিজ্ঞাপনের হাতে উঠে যাচ্ছে। তার মাঝে ওই গোলা-বারুদ-অস্ত্র-শস্ত্রের ব্যবসা কমানোর এমন দুধে-ভাতে সংকল্প বড়ো ম্যাড়ম্যাড়ে লাগে। আবার পাশ ফিরে ঘুমিয়ে পড়ি।

বামপন্থী নেতাদের আজকাল মাঝে মাঝে গর্জে ওঠার দরকার পড়ে। সহৃদয় পাঠক নিশ্চয় এ সব আওয়াজ বদহজমের ঢেকুর বলে মনে করেন না। কিন্তু ক’দিন আগে রেজ্জাক মোল্লা সাহেব কেমন যেন তাল কেটে দিলেন। বলে বসলেন, ‘হেলে ধরতে পারে না কেউটে ধরে’। বাঙালি পাঠক হরগিজ এর মানে বুঝে গেছেন। রাষ্ট্র সংঘের গোলা-বারুদ আর অশান্তি কমানোর উৎসাহ দেখে মোল্লা সাহেবের কথাটাই আবার মনে এল।

স্মিথ সাহেবের কথায় ফিরে আসি। বিজ্ঞানীদের যে ভূমিকায় আমরা দেখতে চাই, এসডিজি খসড়া কর্মসূচিতে তা প্রতিফলিত হয়নি। যে ক’দিন আর বাকি আছে খসড়া কর্মসূচি পাকা করতে তাতে তেমন কোনও মৌলিক রদবদলের আশা নেই। ভাবছি কীসের এই তাড়াহুড়ো! কীসের এই টার্গেট। কার টার্গেট? কার জন্য টার্গেট? এর থেকে কয়েক বছর চুপ করে বসে আত্মানুশীলন করলে ভালো হত না? এত যে বড়ো বড়ো ভুল হচ্ছে, বার বার হচ্ছে। ঠিক হত যদি সত্যি অন্তর্মুখী অনুসন্ধান শুরু করা যেত। হাজির হওয়া যেত সেই সব জায়গায় যেখানে গভীর ক্ষত সৃষ্টি হয়েছে। যাঁদের আমরা অজ্ঞ মনে করি তাঁরা কেমন করে তাঁদের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান দিয়ে অসাধ্যকে সাধন করে চলেছেন। কেন তারা পড়ে আছেন অজানার আড়ালে? অথচ টেকসই উন্নয়নও জনগণেরই উৎসব হওয়ার কথা, তাঁদেরও তো লাগাম ধরার কথা। যাঁরা সংকল্প লিখেছেন তাঁদের নিশ্চয় বোধের অভাব আছে, ঘাটতি আছে উপলব্ধির। প্রয়োজন ছিল সুস্থির আত্মানুসন্ধানের, বেশ কয়েক বছর ধরে। আমাদের নাকি সময় নেই! অথচ কে যে পিছনে তাড়া করছে তা ভালো জানা নেই। অথবা জানলেও বলতে অসুবিধা আছে।

লেখক পরিবেশবিদ ও ‘ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন ফর কনজারভেশন অব নেচার’-এর উপদেষ্টা

কতকথা

যদি আমি মন্ত্রী হতাম তা হলে একটা মন্ত্রকেই সীমিত থাকতে হত। এখন আমি সব মন্ত্রক নিয়েই কথা বলতে পারি। আমার জন্যে মন খারাপ করবেন না।

সুব্রামনিয়ম স্বামী
তিনি মন্ত্রী হতে না পারা প্রসঙ্গে।

ভারতে শুট করা যেন একটা রুদ্ধশ্বাস অভিজ্ঞতা। অজস্র দৃশ্য আর শব্দের ক্যালাইডোস্কোপ। আমি তো দারুণ উৎসাহিত বোধ করি। তবে ক্লান্তিকরও।

লানা ওয়াচয়োস্কি
মার্কিন ফিল্ম নির্দেশক
মুম্বইয়ে শুটিং করার পর।

আমেরিকায় সেট যেন যুদ্ধক্ষেত্র, তাঁরা এতটাই প্রশিক্ষিত আর দক্ষ। কাজেই ডায়ালগ ভালো করে মুখস্থ করে যাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ, ক্যামেরা এক বার চললে চট করে থামে না।

সইফ আলি খান
‘হ্যাপি এন্ডিং’ শুটিংয়ের অভিজ্ঞতা প্রসঙ্গে।

বিসিসিআই দিল্লির রোশনারা ক্লাবে জন্মেছিল। বড়ো হয়েছে ইডেন গার্ডেন্স-এ। কিন্তু তামিলনাড়ু যে কী ভাবে তাকে দখল করে নিল সেটা একটা রহস্য।

বিষেণ সিং বেদি
এন শ্রীনিবাসনের বিসিসিআই প্রেসিডেন্ট হওয়ার সমালোচনা করে।

*** বোধিবৃক্ষ ***

সাম্য

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

মনুষ্যে মনুষ্যে সমানাধিকারবিশিষ্ট-ইহাই সাম্যনীতি। কৃষক ও ভূম্যধিকারীতে যে বৈষম্য, সাম্যনীতিভ্রংশের প্রথম উদাহরণ স্বরূপ তাহার উল্লেখ করিয়াছি। দ্বিতীয় উদাহরণ স্বরূপ স্ত্রীপুরুষে যে বৈষম্য, তাহার উল্লেখ করিব।

মনুষ্যে মনুষ্যে সমানাধিকারবিশিষ্ট। স্ত্রীগণও মনুষ্যজাতি, অতএব স্ত্রীগণও পুরুষের তুল্য অধিকারশালিনী। যে যে কার্যে পুরুষের অধিকার আছে, স্ত্রীগণেরও সেই সেই কার্যে অধিকার থাকা ন্যায়সঙ্গত। কেন থাকিবে না? কেহ কেহ উত্তর করিতে পারেন যে, স্ত্রী পুরুষে প্রকৃতিগত বৈষম্য আছে, পুরুষ বলবান্, স্ত্রী অবলা পুরুষ সাহসী, স্ত্রী ভীরু; পুরুষ ক্লেশসহিষ্ণু, স্ত্রী কোমলা; ইত্যাদি ইত্যাদি; অতএব যেখানে স্বভাবগত বৈষম্য আছে, সেখানে অধিকারগত বৈষম্য থাকাও বিধেয়। কেন না, যাহাতে অশক্ত, সে তাহাতে অধিকারী হইতে পারে না।
ইহার দুইটি উত্তর সংক্ষেপে নির্দেশ করিলেই আপাততঃ যথেষ্ট হইবে। প্রথমতঃ স্বভাবগত বৈষম্য থাকিলেই যে অধিকারগত বৈষম্য থাকা ন্যায়সঙ্গত, ইহা আমরা স্বীকার করি না। এ কথাটি সাম্যতত্ত্বের মূলোচ্ছেদক। দেখ, স্ত্রীপুরুষে যেরূপ স্বভাবগত বৈষম্য, ইংরেজ বাঙ্গালিতেও সেইরূপ। ইংরেজ বলবান্, বাঙ্গালি দুর্বল; ইংরেজ সাহসী, বাঙ্গালি ভীরু; ইংরেজ ক্লেশসহিষ্ণু, বাঙ্গালি কোমল; ইত্যাদি ইত্যাদি। যদি এই সকল প্রকৃতিগত বৈষম্য হেতু অধিকারবৈষম্য ন্যায্য হইত, তবে আমরা ইংরেজ বাঙ্গালি মধ্যে সামান্য অধিকারবৈষম্য দেখিয়া এত চীৎকার করি কেন? যদি স্ত্রী দাসী, পুরুষ প্রভু, ইহাই বিচারসঙ্গত হয়, তবে বাঙ্গালি দাস, ইংরেজ প্রভু, এটিও বিচারসঙ্গত হইবে।
দ্বিতীয় উত্তর এই, যে সকল বিষয়ে স্ত্রীপুরুষে অধিকারবৈষম্য দেখা যায়, সে সকল বিষয়ে স্ত্রীপুরুষে যথার্থ প্রকৃতিগত বৈষম্য দেখা যায় না। যতটুকু দেখা যায়, ততটুকু কেবল সামাজিক নিয়মের দোষে। সেই সকল সামাজিক নিয়মের সংশোধনই সাম্যনীতির উদ্দেশ্য। বিখ্যাতনামা জন ষ্টুয়ার্ট মিল্‌কৃত এতদ্বিষয়ক বিচারে, এই বিষয়টি সুন্দররূপে প্রমাণীকৃত হইয়াছে। সে সকল কথা এখানে পুনরুক্ত করা নিষ্প্রয়োজন।

*** প্রতি সম্পাদক ***

সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ুয়া কমছে

কেন্দ্রীয় সরকার ৬ থেকে ১৪ বছর বয়সের সকল ছেলেমেয়েদের অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষাদান সুনিশ্চিত করার জন্য আইন প্রণয়ন করেছে। এই আইন ১ এপ্রিল ২০১০ সাল থেকে প্রায় সব রাজ্যে চালু হয়েছে।

শিশু শিক্ষা অধিকার আইন কার্যকারী করার প্রধান দায়িত্ব বর্তায় আমাদের শিক্ষক সমাজের উপর। তাঁদের আন্তরিক প্রচেষ্টা ছাড়া ইহা কার্যকরী করা সম্ভব নয়। বিভিন্ন সমীক্ষায় জানা যায় এই আইন লাগু হওয়ার ৪ বছর পরেও এই রাজ্যে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা দিন দিন কমে যাচ্ছে। বর্তমানে বিদ্যালয়গুলিতে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠ্যপুস্তক বিদ্যালয়ে পড়ানো হয় কিন্তু বাড়িতে নিয়ে আসা যাবে না। ছাত্রছাত্রীরা বাড়িতে বসে কী পড়াশুনা করবে? অথচ বেসরকারি বিদ্যালয়গুলিতে ছেলেমেয়েরা বিভিন্ন বিষয়ে পড়াশুনার মাধ্যমে অনেক এগিয়ে যাচ্ছে। স্বাভাবিক ভাবে অভিভাবকগণ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে ছেলেমেয়েদের ভর্তি করানোর ব্যাপারে আগ্রহ কমে যাচ্ছে। বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের নতুন ব্যবস্থাপনার নতুন পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচি অনুযায়ী তাদের বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ দিয়ে শিক্ষিত করে তুলছে। কিন্তু বাস্তবে তাঁদের অর্জিত জ্ঞান শিশুদের মধ্যে প্রতিফলন করাতে পারছে না। আসলে অধিকাংশ শিক্ষক-শিক্ষিকার মধ্যে দায়িত্ববোধ ও আন্তরিকতার অভাব রয়েছে। তাঁরা ছাত্র-ছাত্রীদের শৃঙ্খলা রক্ষার প্রয়োজনীয়তাও লক্ষ্য করে না। অধিকাংশ অভিভাবকগণ ছেলেমেয়েদের নিরাপত্তা, শৃঙ্খলাপরায়ণতা ও পড়াশুনার অগ্রগতি সম্বন্ধে মূল্যায়ন করেন।

> অধিকাংশ শিক্ষক-শিক্ষিকার মধ্যে দায়িত্ববোধ ও আন্তরিকতার অভাব রয়েছে। তারা ছাত্র-ছাত্রীদের শৃঙ্খলা রক্ষার প্রয়োজনীয়তাও লক্ষ্য করে না।

সরকারি বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকারা বেসরকারি বিদ্যালয়ের চেয়ে অনেক বেশি মাইনে পেয়ে থাকেন এবং সুযোগ সুবিধাও বহুগুণ বেশি পান, অথচ তাঁদের মধ্যে শিশুদের প্রতি যত্নবান হওয়া বা আন্তরিকতার সঙ্গে পড়াশুনার করানোর আগ্রহ নেই। অনেক শিক্ষক-শিক্ষিকা আছেন তাঁরা নিজেরা সরকারি বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন কিন্তু তাঁদের ছেলেমেয়েদের ভালো বেসরকারি বিদ্যালয়ে পড়িয়ে থাকেন।

বিদ্যালয়ের পরিদর্শকদের অবস্থা তথৈবচ। তাঁরাও বিদ্যালয়ে এসে কোনও খোঁজখবর বা অভিভাবকদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন কি না জানি না। আমার মনে হয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষা ব্যবস্থার উপর সরকার গুরুত্ব দিয়ে পর্যালোচনা করা উচিত।
অরুণ কর, কলকাতা ৭০

সত্যজিৎ বাদ?

রবিবারোয়ারি-তে (৯-১১) গত শতাব্দীর ’৯০-এর ঘটনাবলীর ফিরে দেখা নিয়ে লেখাগুলোর মধ্যে বিস্ময়কর ভাবে বাদ পড়ে গিয়েছে ২৩ এপ্রিল ১৯৯২-তে সত্যজিৎ রায়ের মৃত্যু এবং তার কিছু দিন আগে ৩০ মার্চ ১৯৯২-তে অড্রে হেপবার্ন-এর হাত থেকে লাইফ টাইম ওয়ার্কস-এর জন্য অস্কার প্রাপ্তি। এই দুটো কি তেমন উল্লেখযোগ্য ঘটনা নয়? এ ছাড়া ওই ১৯৯২ সালেই ১৭ জুলাই কাননদেবী মারা গিয়েছিলেন। আমার মনে হয় এটিও ’৯০-এর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা।
সোমনাথ রায়, কলকাতা ১৫

চিঠি লিখুন এই ঠিকানায়— **প্রতি সম্পাদক**, এই সময়, বেনেট কোলম্যান অ্যান্ড কোম্পানি লিমিটেড, ডায়মন্ড প্রেস্টিজ, নবম তল, ৪১ এ, এজেসি বোস রোড, কলকাতা ৭০০০১৭ । ফ্যাক্স: ০৩৩-৬৬০৩১৩৭৮। ই-মেল: eisamay@timesgroup.com
নিজের মত জানান ফেসবুক-এ। লগ ইন করুন: www.facebook.com/eisamay.com